বন্দী

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

অনেকদিন পরে দেশে ফিরেছি মাত্র দিন-পাঁচ-ছয়ের জন্যে। বাড়িতে চাবি দেওয়া আছে আজ বছরখানেক। স্ত্রীপুত্র ঘাটশিলার বাড়িতে গিয়েছে অনেকদিন। বর্ষাকালে আর নিয়ে আসব না।

বাজারে একটি লাইব্রেরি করেছে ছেলেরা। বিকেলে সেখানে তারা আমায় নিয়ে গেল। সেখানে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করছি, এমন সময় বাইরে থেকে কে বললে, আপনাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। বাইরে এসে দেখি একটি যুবক বেঞ্চির উপর বসে আছে, আমায় দেখে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে উঠল। বললাম, বসুন বসুন, নমস্কার। কোথা থেকে আসছেন?

যুবকের বেশের দিকে চেয়ে আমার একটু অদ্ভুত লাগল। লম্বা প্যান্ট ও হাফ-শার্ট পরা, গলায় দুটো টাই একসঙ্গে বাঁধা। পায়ে দামি চামড়ার জুতো, তবে বর্ষার জলে-কাদায় বিবর্ণ। চোখে চশমা, কব্জিতে হাতঘড়ি। আমায় 'যুক্তকর'-এ নমস্কার করে বললে, চিনতে পারছেন না?

—না।

—কেন, সেই বাগেরহাটে ?

বাগেরহাটে দু বছর আগে একটা সভায় গিয়েছিলাম বটে, কত লোকের সঙ্গেই সেখানে আলাপ হয়েছিল, তার মধ্যে কোনো একজনকে মনে করে রাখার মতো আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি আমার নেই। তবুও মিথ্যে কথা বলতে হল বাধ্য হয়ে। এত আশার দৃষ্টি যুবকের চোখে, কেমন মায়া হল। বললাম, ও, এবার মনে পড়েছে বটে। না চিনতে পারার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে গিয়ে বললাম, —আপনার চেহারা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে।

এমন কেউ নেই যে ভাবে না তার স্বাস্থ্য বর্তমানে ভালো যাচ্ছে না। যুবকটি তখনই বললে, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হচ্ছে এদেশে এসে।

—ও।

—বড় মনের কষ্টে আছি।

—ও।

—আপনার কাছে এলাম—

বলে একটু অপ্রতিভের হাসি হাসল। আমি চুপ করে বসে রইলুম, কোন্ দিকে ওর কথাবার্তার গতি বুঝতে না পেরে।

ও আবার বললে, আপনি যদি একটু—মানে—

আর একবার লাজুক হাসি হেসে ও চুপ করল।

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না কোন সাহায্যের ইঙ্গিত করছে বক্তা! আর্থিক সাহায্য নিশ্চয়ই নয়, বেশভূষা দেখেই সেটা বেশ বোঝা যায়। অন্য কি ধরনের সাহায্য পেতে পারে? খুলেও তো কিছু বলে না।

বললাম, আপনি এখানে আছেন কোথায়?

—চালতেপোতা গ্রামে। বড় কষ্টে আছি। আই অ্যামঅলমোস্ট এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম!

—কেন, কেন?

—পয়সাহাতে নেই, বুঝলেন না! একটুখানি রাণাঘাটে যদি যেতে হয় তাও পরের হাততোলা পয়সার ওপর ডিপেন্ড করতে হয়! আই ফীল লাইক এ হাফ-ড্রাউন্ড ম্যান! কলকাতা তো বহুদূর—কে অত পয়সা ভাড়া দেবে?

—ও।

আর কি বলি ‘ও’ ছাড়া? ব্যাপারটার চারিপাশে এখনো বেশ ঘনীভূত কুয়াশা। কেনই বা নিজের বাড়িতে নিজে বন্দী? কেনই বা কোনো চেষ্টা করে না অর্থ উপার্জনের, বাধা দিচ্ছেই বা কে? ব্যক্তিগত সংবাদ বেশি জিজ্ঞাসা করার দরকারই বা কি আমার?

তার পর ও আপনিই বললে,—বড্ড কষ্ট হচ্ছে এখানে। কখনো পাড়াগাঁয়ে থাকিনি। একটা মানুষ নেই যার সঙ্গে মিশি। আজ আপনি এসেছেন শুনে চালতেপোতা থেকে হেঁটে এলাম।

—হেঁটে এলেন? সে যে খাঁটি ছ মাইল রাস্তা!

—বেশি হবে, প্রায় সাত মাইল। তবে একটা সোজা রাস্তা আছে মেহেরপুর রেল ফটকের পাশ দিয়ে মাঠের মাঝখান বেয়ে। এখন বর্ষায় সে পথে বেজায় কাদা।

—আপনার বড্ড কষ্ট হয়েছে—

—এ আর কিসের কষ্ট, আসল কষ্ট পাচ্ছি গাঁয়ে বসে। একটা কালচার্ড লোক নেই। না বোঝে সাহিত্য না বোঝে কোনো কিছু। জানেন, পিকাসো বলে যে একজন শিল্পী আছে, তাই তারা কোনোদিন শোনেনি!

—সেটা অপরাধ নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজই বা ক’জন জানে পিকাসোর নাম?

—যাই বলুন, আমার শিক্ষা একটু অন্য রকম। আমি ভালোবাসি কালচার, ভালোবাসি আর্ট। যখন ইউনিভার্সিটিতে এম.এ পড়তাম, সেসময় একবার লাইব্রেরিয়ানের কাছে সেগান্ সম্বন্ধে বই চাইতেই তিনি—

—আপনি—এম.এ পাশ ?

যুবক পুনরায় অপ্রতিভের হাসি হেসে চুপ করলে একটুখানির জন্যে। বললে, পাশ করিনি। এক বছর পড়েছিলাম—ওঃ, নাইনটিন থার্টিনাইন টু নাইনটিন ফর্টি টু এই তিন-চার বছর—আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ক’টি বছর কেটেছে! বলে সে খানিকক্ষণ স্বপ্নাতুর আকুল দৃষ্টিতে জানলার বাইরে গিরীন ঘোষের ধানের আড়তের দিকে চেয়ে রইল।

তার পরে বললে, —জানেন,আমি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখে স্টেটসম্যানে পাঠিয়েছিলাম। ফেরত পাঠিয়েছে—নেয় না। ইংরেজি কবিতাও লিখে থাকি! শুনবেন?

—বেশ বেশ। বলুন না।

—আচ্ছা, একটু পরে বলব। এখন এদের সামনে কি বলি বলুন। একখানা উপন্যাস লিখেছি—দু ভল্যুমে শেষ হচ্ছে। প্রায় ন’শ পাতা। আপনাকে একদিন শোনাতে চাই।

—বেশ। একদিন নিয়ে আসুন না, তবে এই হপ্তার মধ্যে। নয়তো আবার চলে যাব।

—কালই নিয়ে আসব। আর ছোটগল্পও লিখেছি চার-পাঁচটা। সেগুলো যদি কোনো কাগজে বের করে দেন—

—আপনি পাঠিয়ে দিন কোনো ভালো মাসিক পত্রিকার ঠিকানায়। তাদের ভালো লাগে, ছাপবে।

—ওরা নেয় না। ভালো গল্প পাঠিয়ে দেখেছি, পড়েও দেখে না। ফেরত দেয়। সেইজন্যেই তো আপনার কাছে আসা—যদি একটু সাহায্য করেন। আসল কথা কি জানেন, আই অ্যাম এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম! দুটো টাকা চাই, রাণাঘাটে যাব তা বাড়িতে চাইলে কেউ দেবে না।

আবার সেই কথা। এবার জিগ্যেস না করে পারলাম না। বললাম, বাড়িতে কে আছেন?

—সবাই আছেন। বাবা, মা—

–মা বেঁচে?

—আপন মা নয়। তাহলে আর ভাবনা ছিল কি! বিমাতা। বাবা বুড়োবয়সে বিমাতার বশ। আমি কেউ নই বলেই মনে হচ্ছে। বাড়ি থাকি, দুটো খেতে পাই—এই পর্যন্ত। একটা পয়সা হাতখরচ দেবে না। আই লাইক টু বাই বুকস, আই নীড এ নিউজ-পেপার—এসব কোথা থেকে হয় বলুন!

—তাই তো।

কি আর বলি, লোকটি আমাকে বড়ই বিপদে ফেললে দেখছি। সাংসারিক ব্যাপারের এসব কথা আমাকে শোনানোর দরকার কি? বলেই ফেললাম কথাটা শেষে।

—আপনার তো চাকরি করা উচিত ছিল?

—ওই যে বললাম, আই অ্যাম এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম—

এ কথাটা বার বার বলে কেন? কে তোকে বেঁধে রেখেছে দড়ি দিয়ে বাপু? আর তাহলে তুমি এখানেই বা আস কি করে? যাক, ওসব কথায় আমার কোনোই দরকার নেই।

চুপ করেই রইলাম।

হঠাৎ সে বললে, হ্যাঁ, আমার ইংরিজি কবিতাটি শুনুন—

—বেশ বেশ, আনন্দের সঙ্গে শুনব—

—একটু বাইরের দিকে নির্জনে চলুন, এখানে আবার মেলা লোক রয়েছে। না থাকলেও জমে যাবে কবিতার আবৃত্তি শুনলে।

লাইব্রেরির বাঁদিকে মাঠের মধ্যেকার একটা কতবেল গাছ, তার পাশে বৈঁচি ঝোপ, তার পাশে একটা ডোবা—এই নির্জন জায়গাটাতে বৈঁচি ঝোপের আড়ালে সে আমায় নিয়ে গিয়ে হাত-পা নেড়ে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলে—ও মাই বিলাভেড ইংল্যান্ড! এই হল তার কবিতার প্রথম লাইন। বেশ চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে। ইংরিজি কবিতাটিও মন্দ লেখেনি—তবে কি আর শেলি, শেক্সপিয়ার, কীট্‌স্‌ কিংবা ব্রাউনিঙের মতো হবে ওর কবিতা? না তরু দত্ত বা রবীন্দ্রনাথের মতো হবে? একজন বাঙালি যুবকের সাধারণ বুদ্ধিবিদ্যার পক্ষে মন্দ শুধু নয়—ভালো।

আমার সত্যি আশ্চর্য লাগল। এর মধ্যে দেখছি জিনিস আছে।

লাইব্রেরিতে স্কুলের ইংরিজি পড়ানোর মাস্টার ব্রজেনবাবু বসেছিলেন, তাকে ডেকে ওর আবৃত্তি শোনালাম। তিনি বললেন, বাঃ বাঃ, সত্যি খুব ভালো। আপনি কি করেন?

আমি বললাম, কিছুই করেন না। দিন না আপনাদের ইস্কুলে একটা চাকরি।

যুবকটিও হাত কচলে বিনীতভাবে বললে, দিন না, তা হলে তো খুব ভালো হয়।

ব্রজেনবাবু অপ্রতিভভাবে বললেন, আমি আপনার মতো লোকের চাকরির কি ব্যবস্থা করব বলুন—হেডমাস্টারকে বরং বলুন—বেশ ইংরিজি জানেন আপনি।

যুবক উৎফুল্ল মুখে বললে, কলেজে আমাদের ক্লাসে আমার নাম ছিল 'দি পোয়েট'। শ্যামসুন্দর রায়কে চেনেন তো? চেনেন না? ও আমার ক্লাস-মেট। ফিলজফিতে অনার্স ছিল ওর। কলেজ লাইব্রেরিতে বসে দুজন একসঙ্গে পড়াশুনা করতাম। বিলেত যাওয়ার কত শখ ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে দুজনে এই রকম বই পড়ব কল্পনা করতাম। বললাম যে আপনাকে, কলেজের দিনগুলো—নাইনটিন থার্টিনাইন টু নাইনটিন ফর্টি টু—এই গিয়েছে বেস্ট ইয়ার্স অব মাই লাইফ—আর সেসব দিন ফিরবে না।

আমি কৌতুহল অনুভব করছিলাম ওর কথায়। হাত-পা নেড়ে বেশ কথা বলে। বলবার ক্ষমতা আছে। এসব অজ পাড়াগায়ে বসে ওই সব অতীত দিনের গল্পের সময় যে ছবিটা ওর মনে জাগে, ও সুখ পায় তাতে। সুতরাং বলতে ভালোবাসে সেসব গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা। ওর জীবন ওর কাছে বড়, আমি তার কি বুঝি!

আরো বুঝলাম বেচারি শ্রোতা পায় না। এসব কথা শোনবার লোক এ অজ পাড়াগাঁয়ে নেই। তাই বোধ হয় আমার খোঁজ করে আমায় বার করেছে। শুনিয়ে ওর সুখ হয়, আমার শুনতে আপত্তি কি।

বললাম, আপনার বন্ধু শ্যামসুন্দরবাবু এখন কোথায়?

ওর মুখখানা কালো হয়ে গেল যেন। কি যেন একটা ব্যথা পেয়েছে। কি একটা কথা খানিকক্ষণ ভাবল, তার পর আস্তে আস্তে বললে, সে লন্ডনে থাকে।

লন্ডনে? কিছু পড়তে গিয়েছেন?

ইন্ডিয়া অফিসে চাকরি করে আর সেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করে। যা আমরা বসে বসে কল্পনা করতাম তাই। আমার হল না, ওর হল—আর আমি এই পাড়াগাঁয়ে বসে বসে—

সান্ত্বনার সুরে বললাম, কি আর করবেন বলুন। এমন কত হয়।

—হয় জানি, কিন্তু—

আবার সেই স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে বৈঁচি ঝোপ আর ডোবার ওধারে দীর্ঘ টানা দূরবিস্তৃত আউশ ধানের মাঠে কচি কচি সবুজ ধানের জাওলার দিকে চেয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, জানেন, ডেভনশায়ার ইজ দি ফেয়ারেস্ট কান্ট্রি ইন ইংল্যান্ড! লর্না ডুনের লেখক বলে গিয়েছেন। ওঃ, ন্যারো লেন্স্ অব ডেভন! কত জিনিস ঘটে গিয়েছে ডেভনশায়ারে! ডেন্স্রা এসে ওর গ্রামগুলো পুড়িয়েছিল, স্প্যানিয়ার্ডরা ওর কোস্ট আক্রমণ করেছে, ইংল্যান্ডের সিভিলওয়ারে ওখানকার লোক লড়েছে। সমস্ত ডেভনশায়ার এক সময়ে বনভূমি ছিল। হরিণ চড়ে বেড়াত।র‍্যালে, ড্রেক, হকিন্স্—সব ডেভনের লোক। বিরাট মুরল্যান্ড, বাল্যকাল থেকে কত সাধ ছিল, সন্ধেবেলা মুরল্যান্ডে বেড়িয়ে বেড়াব, ক্রমলেক দেখব। লর্না ডুন পড়ে পাগল হয়েছিলুম কলেজে, ডুন কাউন্টি দেখব ব্ল্যাকমুরের অমর কাহিনী। লিন্টন! লিন্মাউথ! ইনফ্রাকুম! এসব কতদিনের স্বপ্ন! হল না। কোথায় ডেভনশায়ার লেনের সৌন্দর্য, কোথায় ডার্টমুর—আর কোথায় পড়ে আছি চালতেপোতা গাঁয়ে বাঁশবাগানে মশার কামড় খেয়ে! কি অদ্ভুত আয়রনি অব ফেট, তাই ভাবি। শ্যামসুন্দর দিব্যি দেখচে। আমি শুয়ে ভাবি ও লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছে, উইন্ডারমিয়ার দেখছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেক অঞ্চল দেখছে—আর আমি কি করছি? ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে যায়—রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। কি হতে চলেছিলাম আর কি হলাম! জানেন, ইংল্যান্ডকে এত ভালোবাসি! কেন জানিনে, মনে মনে এত ভালোবাসি! কত সাধ ওখানে যাব—আমারই হল না।

কি বিপদ! ডোবার ধারে বৈঁচি ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে এ উইন্ডারমিয়ার হ্রদের ছবি দেখতে লাগল! লোক জমে যাবে এখুনি ওর উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে। অবিশ্যি এখন কেউ নেই এখানে। ব্রজেনবাবু আবৃত্তি শোনবার পরে চলে গিয়েছেন। আমি আবার সান্ত্বনার সুরে বললাম—আপনার বয়স বেশি না, কত বেশি বয়সের লোক বিলেতে যাচ্ছে না কি? আমার এক বন্ধু এতকাল পরে এবার এক মালজাহাজে ডানবার বন্দরে গেল। সে ইস্কুলে মাস্টারি চাকরি পেয়েছে। ভিক্টোরিয়া নায়ান্জা হ্রদের ধারে একটা ছোট শহরে। অনেক ভারতীয় আছে, তাদের ইস্কুল আছে—সেই ইস্কুলে। দেখুন তো, মনের কত তেজ ও উৎসাহ! ভারত স্বাধীন হয়েছে, এখন ভারতের তরুণদের সামনে কত বিস্তৃততর ক্ষেত্র, কত কাজ কত দিকে, কত দেশে কত ডাক পড়বে! আর্মিতে যান, নেভিতে যান, ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে ঢোকবার চেষ্টা করুন, ব্যবসা করুন, খবরের কাগজে লিখুন, বই লিখুন, বক্তৃতা করুন—আপনি এ বয়সে বসে থাকবেন কি? কিসের বলছেন বন্দী, বন্দী—কিসের বন্দী আপনি?

যুবক বসে বসে আমার কথা শুনলে। কোনো উত্তর দিলে না। বিশেষ কোনো উৎসাহ পেয়েছে আমার কথা থেকে বলেও মনে হল না।

একটু পরে সে বললে, আমার অবস্থা জানেন না। কি কষ্টে যে আছি, তা আমি জানি। তাই অ্যাম রিয়্যালি এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম! মানে বাবা এ বয়সে আমার বিমাতার বাধ্য। তিনি সংসারের তবিল রাখেন বিমাতার কাছে। আমার একটা পয়সা নিতে হলেও বিমাতার কাছে চাইতে হবে। তিনি মুখ ভার করেন পয়সা চাইলেই, পারতপক্ষে দিতে চান না। বাবা চাকরির চেষ্টা করতে বলছেন, তাও তো কলকাতা যাবার গাড়িভাড়া চাই। এই কাছে রাণাঘাটে যাওয়ার পয়সা পাওয়া যায় না, তা কলকাতার ভাড়া দিচ্ছে কে বলুন? এই পায়ে হেঁটে রোজ বিকেলে যতটা বেড়াই। কাজেই প্রিজনার ছাড়া আর কি বলুন!

—তাই তো দেখছি। তবে আপনি এ ভাবে বাড়ি বসে থাকলেও তো এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না। আপনাকে বাড়ি থেকে বেরুতে হবে, তা যতই দুঃসাধ্য হোক। আপনি কি বিয়ে করেছেন?

যুবক ঈষৎ কুণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে বললে, তা করেছি।

—ও।

সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নেই। যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও জটিল। স্ত্রী এবং সম্ভবত দু-একটি পুত্রকন্যা নিয়ে ইনি পিতার সংসারের বেকার অতিথি, এই বর্তমান দুর্মূল্যতার বাজারে।

যুবক যেন খানিকটা আপনমনেই বলতে লাগল, কত আশা ছিল, এখনো সে আশা আমি ছাড়িনি—বিলেত আমি যাবই। এই মূর্খ আনলেটার্ড পাড়াগাঁয়ে আমি বেশি দিন পড়ে থাকব না। একখানা ভালো বই কি কাগজ পাইনে পড়তে। অথচ এত পড়তে ভালোবাসি। শেলির একটা ভালো এডিশন কিনব, বাবার কাছে টাকা চাইলে পাব না জানি, কেননা টাকা তাঁর কনট্রোলের মধ্যে নয়। আর একটা কথা আপনাকে বলি—

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি একখানা ভালো উপন্যাস লিখেছি—দু ভল্যুম— বড় উপন্যাস। আপনাকে একদিন শোনাব।

—বেশ বেশ। যেদিন ইচ্ছে শোনাবেন।

—আপনার কবে সময় হবে?

—বিকেলে যে কোনোদিন আসতে পারেন।

—আপনি দেখে নেবেন উপন্যাসখানা, তার পর একজন। পাবলিশার ঠিক করে দেবেন আমাকে। দেখি আপনার দয়ায় যদি এবার মুক্তি পাই বন্ধন থেকে আমি তাহলে বাঁচি আমি বাঁচি—উঃ, আমি মরে যাচ্ছি—আপনি জানেন না—ও, হোয়াট এগনি অ্যান্ড টর্চার আই অ্যাম পাসিং থ্রু!

বেলা গিয়েছিল।

বৈঁচিঝোপে রাঙা রোদ এসে পড়েছে।

লাইব্রেরি থেকে লোক চলে যাচ্ছে, পাড়াগাঁয়ের লাইব্রেরি কেরোসিন তেলের খরচ যোগাতে পারে না। বাদুড় উড়ে যাচ্ছে বাঁওড়ের ওপর দিয়ে।

এই সন্ধ্যার আকাশের তলায় এই যুবকের মনের বেদনা আমাকে স্পর্শ করল।

কিসের বাঁধনে এই লেখাপড়া-জানা লোকটি পড়েছে তার খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম।

একটি স্নেহময় পিতার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র— একদিন যার জন্মলগ্নে শুভশঙ্খ বেজেছিল একটি আনন্দমুখর গৃহস্থ বাটীতে, আজ সেই পুত্র বড় হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে, বিবাহ করেছে—তবুও সেই পিতা আজ অসুখী কেন? সেই পুত্রই বা কেন সেই গৃহে নিজেকে বন্দি বলে মনে করছে আজ? প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের লাজাবন্ধন-ন্যায় কাকে বলে আজ ভালোভাবে বুঝলাম।

যুবক বললে, তবে আজ আমি—সন্ধে হয়ে যাচ্ছে। আমার কী, আমি রাত হলেও অন্ধকারে যেতে পারি—যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততটুকুই ভালো থাকি।

—না না, দেরি না করাই ভালো। চালতেপোতা গ্রামের রাস্তা বড় খারাপ।

তাহলে উপন্যাসখানা কাল নিয়ে আসব? দেখবেন একটু? ভালো উপন্যাস। চূর্ণী নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, একটা ডুমুরগাছের তলায় বসে মনে কেমন ভাব এসে গেল—কী চমৎকার যে লাগল! যেন কোথায় এসেছি! কী সুন্দর পৃথিবী! অমনি এই উপন্যাসের প্লটটা মনে এসে—

—বুঝেছি। আসবেন কাল। নমস্কার।

যুবক প্রতিনমস্কার করে ছন্নছাড়া হতভাগ্যের মতো শূন্যদৃষ্টি নিয়ে একবার চারদিকে চাইলে। কী দেখলে চেয়ে জানিনে, সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। তারপর হনহন করে মাঠ পার হয়ে বড়রাস্তায় গিয়ে উঠে হেঁটে চালতেপোতার দিকে চলল। বড় মমতা হল ওর ওপর। ওর মনে রস আছে, অনুভূতির যাওয়া-আসা আছে, তা সত্ত্বেও ওর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ওর বাপের চোখের সামনে। ওর তরুণী স্ত্রী রয়েছে বাড়িতে, তবুও ঘরে ফিরতে ওর মনে আনন্দ নেই। এত কষ্ট করে দু ভল্যুম উপন্যাস লিখে কোন্ সার্থকতা আসবে ওর জীবনে? আমি জানি কোনো প্রকাশকই হঠাৎ তো ওর মতো অজানা লেখকের উপন্যাস ছাপতে চাইবে না, ভালো হলেও না। ওর লেখক হওয়ার আশা আকাশ-কুসুম, যেমন আকাশ-কুসুম ওর বিলেতে যাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

লাইব্রেরিতে ফিরে গেলাম।

সেখানে দু-একজন তখনো বসে ছিল। একজন বললে, পাগলটা চলে গেল? আচ্ছা ভ্যাজোর-ভ্যাজোর আরম্ভ করে দিয়েছিল আপনাকে নিয়ে সন্ধের সময়!

—কে পাগল?

—আরে ওর মাথায় গোলমাল, জানেন না, সেই জন্যেই ওর বাবা ওকে কোথাও বেরোতে দেন না। কেবল বলে, বিলেতে যাব, এখানে যাব ওখানে যাব। সৎমা বড় কড়া, ওকে ঠিক শাসনে রেখেছে। ওর নামই হল পাগলা যতীশ, ভীষণ ছিটগ্রস্ত—ওর বাবা সেদিন বড় দুঃখ করছিলেন ইস্টিশন মাস্টারের কাছে। বলছিলেন, এত আশা করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, বিয়েও দিয়েছিলেন, ছেলেও বিএ পাশ, অথচ সব কিছুই গোলমাল হয়ে গেল।

সত্যি তো! ছেলে হল, সে ছেলে শিক্ষিত হল, বিয়েও করলে। সে ছেলে ভাবুক, কবি, মার্জিত রুচি, অনেক কিছু জানে, অনেক কিছুর খবর রাখে।

তবে কিসের অভাবে সে সংসারের বোঝা হয়ে দাঁড়াল আজ? এর উত্তর কে দেবে? কেন এমন হয় কি জানি!